চাষবাস

এক ঝলকে পশ্চিমবঙ্গের লালচে কাঁকুড়ে মাটি অঞ্চলের একটি অন্যতম বাগিচা ফসল হল কাজুবাদাম। এই ফসলের উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে। পর্তুগিজরা প্রথম কাজুবাদামের আমদানি করে গোয়াতে। সাধারণত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও বননায়নের জন্য কাজুবাদামকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্তমানের আমাদের দেশে সমুদ্র উপকূল রাজ্যগুলিতে কাজুবাদামের চাষ হয়।

পেয়ারা গাছে বছরে দুইবার ফুল আসে। একবার বর্ষায় ও আর একবার শীতকালে। বর্ষাকালের ফল স্বাদে পানসে হয় ও রোগ পোকা বেশি লাগে। শীতকালের ফলের মিষ্টতা বেশি থাকে। রোগ পোকা কম হয় ।য়এই সময় ফলের আকৃতি রং সুন্দর হয়। বাজারদর খুব ভাল থাকে। লিখছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **কমল কুমার মন্ডল**

উন্নত প্রথায় পেয়ারা চাষ

পেয়ারা একটি অধিক সহিষ্ণু ফল গাছ। এই ফল অধিক ভিটামিন সি ও খনিজ লবণে সমৃদ্ধ। তাই একে গরিবের আপেল বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই কম-বেশি পেয়ারার চাষ হয়। পেয়ারার ফুল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এখন সারাবছর ধরে পেয়ারা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

জাত নির্বাচন : আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পেয়ারার যে সব জাত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় সেগুলি হল, এল-৪৯, এলাহাবাদ সফেদা, বারুইপুর ও খাজা পেয়ারা। এইসব জাতগুলির মধ্যে খাজা পেয়ারা ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে। এই জাতের ফলের আকার যেমন বড়, দেখতে সুন্দর ও ফলের মধ্যে বীজ কম থাকে।

বংশবিস্তার : পেয়ারার গুটি ও জোড় কলম করে চারা তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ বাগান গুটি কলমের চারা দিয়ে তৈরি। যে সব অঞ্চলে পেয়ারার ঢলে পড়া রোগ দেখা যায় সেই সব জায়গায় জোড় কলমের চারা লাগানো উচিত।

গাছ লাগানোর পদ্ধতি ও সময় : পেয়ারার একবছর বয়সের চারা বর্ষার শুরুতে লাগাতে হবে। গাছ বসানোর ১ মাস আগে ২ ফুট চওড়া, ২ ফুট গভীর ও ২ ফুট লম্বা গর্ত ১৫ ফুট অন্তর অন্তর গ্রীষ্মকালে কাটতে হবে। গর্ত কাটার সময় অর্ধেক উপরিভাগের মাটি একদিকে এবং বাকি অর্ধেক নিচের মাটি গর্তের অন্য ধারে রাখতে হবে। গর্ত কাটার ৭-১০ দিন পর প্রত্যেক গর্তে ২০ কেজি পচা গোবর সার ৫০ গ্রাম পটাশ, ১০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও উপরিভাগের মাটি ভাল করে মিশিয়ে ভরে দিতে হবে এবং বাকি গর্তের নিচের মাটিগুলি গর্তের উপরে দিয়ে টিপির মতো করে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ : বছরে ২ বার সার প্রয়োগ করা উচিত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে। ২-৩ বছরের চারা গাছে ১০ কেজি গোবর সার, সঙ্গে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম পটাশ ....

জলসেচন : সার দেওয়ার পর বৃষ্টি না হলে জল সেচন করতে হবে। শীতকালে ফুল আসার পর ১৫-২০ দিন অন্তর জল সেচন করতে হবে।

শাখাপ্রশাখা বেঁকিয়ে ফল ধরা

নিয়ন্ত্রণ : পেয়ারা গাছে বছরে দু'বার ফুল আসে। একবার বর্ষায় ও আরেকবার শীতকালে। বর্ষাকালের ফল স্বাদে পানসে হয় ও রোগ পোকা বেশি লাগে আবার শীতকালের ফলে মিষ্টতা বেশি থাকে, রোগ পোকা কম হয়। এই সময় ফলের আকৃতি, রং সুন্দর হওয়ায় বাজার দর খুব ভাল থাকে।

অসময়ে অথবা শীতকালে পেয়ারা গাছে ফুল ও ফল ধারণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে গাছের শাখা ও প্রশাখা বেঁকিয়ে। গাছের ডাল বেঁকিয়ে অসময়ে ফুল ধরা নিয়ন্ত্রণ করা হয় যখন গাছের বয়স ২ থেকে ৫-৬ বছর বয়স হবে। গাছের বয়স বেশি হলে ডাল সহজে নোয়ানো যায় না।

সাধারণত বছরে দু'বার এই পদ্ধতিতে পেয়ারার ফুল ও ফল নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ মে-জুন মাস পর্যন্ত একবার ডাল বাঁকানো হয়। আবার হেমন্তকালে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে দ্বিতীয়বার ডাল টানা হয়। ডাল নোয়ানোর ১০-১৫ দিন আগে গাছ পিছু ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম পটাশ, ৫০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ১০ কেজি গোবর সার গাছের গোড়ায় দিয়ে মাটি ঢেকে জল দিতে হবে। সার দেওয়ার ১০-১৫ দিন পর প্রত্যেক ডালের অগ্রভাগের প্রায় ১ ফুট মতো পাতা, ফুল ও ফল রেখে বাকি পাতা, ফুল, ফল ও ছোট ডাল কেটে ফেলা হয়। এইভাবে গাছের সব ডালগুলিকে তৈরি করে বেঁকিয়ে মাটির কাছাকাছি নিয়ে আসা হয়। তারপর সব ডালগুলিকে সুতলির সাহায্যে গাছের কাণ্ডের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে ডাল বাঁকানোর ৭-১০ দিন পর নতুন ডাল বেরোতে শুরু করে। আবার হেমন্তকালে ডাল বাঁকানোর ১৫-২০ দিন পর নতুন ডাল গজাতে শুরু করে। নতুন ডাল ১ সেমি মতো হলে বাঁধন খুলে দিতে হবে। সাধারণত ডাল নোয়ানোর ৪৫-৬০ দিন পর নতুন শাখায় ফল ধরতে শুরু করবে। এটা লক্ষ করা গিয়েছে যে ডাল বাঁকানোর পর যদি বৃষ্টি আসে তাহলে নতুন শাখায় বৃদ্ধি অস্বাভাবিক ঘটে এবং ওই শাখায় ফুল আসবে না। অর্থাৎ ডাল বাঁকানোর ৩-৪ সপ্তাহ অবধি বৃষ্টি বা আর্দ্র আবহাওয়া ফুল আসার পক্ষে ক্ষতিকারক।

এইভাবে গ্রীষ্মকালে (মে-জুন মাস) ডাল বাঁকানো হলে ফল পাকতে শুরু করবে অক্টোবর-জানুয়ারি মাসের মধ্যে। আবার সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে ডাল নোয়ালে ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাসে ফল পাকবে।

ফলন : একটি ৩-৪ বছর গাছের গড় ফলন ২৫-৩০ কেজি হবে। প্রতি কেজি পেয়ারা ২০-২৫ টাকা দরে বিক্রি হলে গাছপিছু আয় হবে ৫০০-৬০০ টাকা। প্রতি বিঘাতে আয় হবে ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা।

একটি ৩-৪ বছর গাছের গড় ফলন ২৫ থেকে ৩০ কেজি হবে। প্রতি কেজি পেয়ারা ২০ থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রি হলে গাছ পিছু আয় হবে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা। প্রতি বিঘাতে আয় হবে ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা।

সপ্তাহের মুখ

নারায়ণ চন্দ্র বায়েন

প্রান্তিক চাষী। জমির পরিমাণ মাত্র আড়াই বিঘা। সেই জমিতে ধান চাষ করে ৬ জনের সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব ছিল। তাই অন্যের বাড়িতে জনমজুরের কাজও করতে হত বীরভূমের পাঁরুই থানার ইমাদপুর গ্রামের নারায়ণ চন্দ্র বায়েনকে। বছর দশেক আগে জীবনের চাকা ঘুরে যায় গ্রামের অদূরে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক গবেষণা খামারে কাজ করতে গিয়ে। সেখানে অধ্যাপক কমল কুমার মণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় হয় নারায়ণবাবুর। তাঁর কাছে সব্জি চাষ, ফল চাষের হাতেকলমে শিক্ষালাভ করেন। শেখেন ফলের কলমের চারা তৈরিও। তারপর থেকেই চাষবাসের চিন্তাভাবনারও বদল ঘটে তাঁর। এখন তিনি সারাবছর এক বিঘা জমিতে সব্জি চাষ করেন। বাকি দেড় বিঘা জমিতে ধান চাষ করেন। অধ্যাপক কমল কুমার মণ্ডলের পরামর্শে নারায়ণবাবু অসময়ের সব্জি চাষে জোর দিয়েছেন। তাতে লাভ বেশি হচ্ছে। তাই তিনি শীতকালে উচ্ছে, শসা, ঢেঁড়শ, এই জাতীয় সব্জি চাষ করেন। সব্জি তুলে নিজেই হাটে গিয়ে বিক্রি করেন নারায়ণবাবু। এক বিঘা জমি থেকে বছরে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা উপার্জন করেন তিনি। বাড়িতে খাওয়ার জন্যও তাঁকে সব্জি কিনতে হয় না। এছাড়া তিনি পুকুর পাড়ের পতিত জমিতে ফলের বাগান করেছেন। সেখানে কাঁচকলা, মর্তমান ও কাঁঠালি কলার বাগান করেছেন। কলা বিক্রি করে বাড়তি উপার্জন করছেন। ফলগাছের কলমের চারা তৈরি শেখায় লাভ হয়েছে তাঁর। বিভিন্ন গ্রামে ডাক পান কলমের চারা তৈরি করে দেওয়ার জন্য। আম, কুল, পেয়ারা ও লেবু গাছের কলম করে দিয়ে পারিশ্রমিক পান তিনি। নারায়ণবাবু চাষীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, সব জমিতে ধান চাষ না করে কিছু জমিতে সব্জি চাষ করার। তাতে অনেক বেশি উপার্জন সম্ভব হবে।

সঠিক পদ্ধতিতে পান চাষ করুন

বহু রাজ্যে পান চাষ হয়। তার মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে পশ্চিম বঙ্গ। পান একটি অর্থকরী ফসল। সঠিক পরিচর্যা করতে পারলে পান চাষ করে ভাল আয়ের সুযোগ রয়েছে। জমি নির্বাচন, বরোজ তৈরি ও পরিচর্যা নিয়ে লিখেছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **কাজল সেনগুপ্ত**

আমাদের এক অর্থকরী ফসল হল পান। লতানো এই গাছের পাতা আমরা খাই—তবে সরাসরি, অর্থাৎ কাঁচা অবস্থায়। ভারতের বহু রাজ্যে কম-বেশি এই ফসলের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গ যদিও প্রথম স্থানে রয়েছে। এ রাজ্যে 'বাংলা', 'মিঠা', 'সাঁচি'—এই তিন ধরনের পানের চাষ হয়। এদের মধ্যে 'মিঠা' পানের কদর বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে 'বরোজ পান' এবং 'গাছ পান' এই দুই পদ্ধতিতে পানের চাষ হয়—যদিও 'বরোজ' পানের এলাকা বেশি। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু (আবহাওয়া) পান চাষের উপযোগী। তবে বরোজের মধ্যে এক কৃত্রিম পরিবেশে পান চাষ করে পাতার ফলন ও পূর্ণগত মান বাড়ানো হয়। জল নিকাশের সুবিধাযুক্ত দোঁয়াশ মাটি পান চাষের পক্ষে উপযুক্ত বা আদর্শ। বরোজের মাটির pH (অম্লত্ব-ক্ষারত্বের মাপকাঠি) ৭.০-এর কাছাকাছি থাকা দরকার। জমি ভাল করে চাষ দিয়ে সারিতে পানের লতা (চারা) লাগানো হয়। দুটি সারির (যার স্থানীয় নাম 'পিলি') মধ্যে ৬০ সেমি (২ ফুট) দূরত্ব রাখা উচিত, আর দুটি চারা বা লতার মধ্যে দূরত্ব রাখা উচিত ১২-১৫ সেমি। একটি ৪০০ বর্গমিটার (১০ ডেসিমেল) বরোজের জন্য প্রায় ৫০০০টি চারা লাগে। বরোজের ভিতরকার উপযুক্ত অম্ল আবহাওয়া (Micro climate), ... পরিচর্যা, পোকা বা রোগের আক্রমণ কম রাখা এসব মাথায় রোখে বরোজের যে সঠিক উচ্চতা সুপারিশ করা হয় তা হল ২ মিটার (৬ ফুট), বরোজের উচ্চতা এর কম বা বেশি হলে রোজকার কাজের অসুবিধা হয়, তাছাড়া ভিতরের অণু-আবহাওয়া পাল্টে গিয়ে তা পান চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার খুব বেশি ছায়া বা বদ্ধ পরিবেশ পান চাষের পক্ষে আদর্শ নয়, এতে রোগ ও পোকার উপদ্রব বেড়ে যায়, পাতার ফলনও কমে যায়।

পানের পাতা বেড়ে বরোজের ছাদের কাছাকাছি চলে এলে লতা নামানো হয়, একে 'ভাঁজ' দেওয়া বলে। বছরে বেশ কয়েকবার এই 'ভাঁজ' দেওয়া হয়। মনে রাখতে হবে বর্ষাকালে ভাঁজ দিলে অর্থাৎ লতা নামালে তা মাটির কাছাকাছি গুটিয়ে রাখা উচিত—মাটি পর্যন্ত নামালে অর্থাৎ লতা মাটি স্পর্শ করলে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যেতে পারে। পান গাছে যে সব মারাত্মক রোগের আক্রমণ হয় তারা বেশিরভাগই মাটি বাহিত (Soil borne) এবং রোগের প্রাদুর্ভাব বর্ষাকালে বেড়ে যায়। তাই বর্ষাকালে লতা নামালে উল্লিখিত সতর্কতা নেওয়া দরকার।

পান চাষের ৪টি মূল বিষয় হল—

১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে চাষ,

২) সঠিক পরিচর্যা,

৩) কম পরিমাণে বারে বারে জৈব সার ব্যবহার করা এবং

৪) প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া।

পান পাতার জন্য মূলত নাইট্রোজেন ঘটিত সারের দরকার। জৈব সারের মাধ্যমে এই N-খাদ্য দেওয়া উচিত। এতে ফলন ভাল হয় এবং রোগ-পোকার প্রাদুর্ভাব কম হয়। বিভিন্ন রকমের খোল/খইল (allcakes), কম্পোস্ট, কেঁচো সার, গোবর সার এসব জৈব সার ব্যবহার করা ভাল, এবং প্রায় প্রতিমাসে অল্প পরিমাণে এ ধরনের যে কোন জৈব সার ব্যবহার করা ভাল। ৪০০ বর্গমিটার (১০ ডেসিমেল) বরোজে বছরে প্রায় আট (৮) কেজি N (নাইট্রোজেন) লাগে—অর্থাৎ প্রতিবছর এই এলাকার বরোজে প্রায় ১৬০ কেজি জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে—মানে প্রতি মাসে ১৩-১৪ কেজি। খোল (খইল) ব্যবহার করলে একইরকম খোল না দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্ন রকমের খোল দিলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। আর জমিতে উইপোকার উপদ্রব না থাকলে গোবর সার ব্যবহার করা যায়—এতেও ভাল ফলন পাওয়া যায়। বছরে একবার, অর্থাৎ কোনও এক মাসে (বর্ষাকালেই ভাল) নিম খোল ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়, এতে পোকার আক্রমণ এবং কৃমি শত্রুর আক্রমণ কম হয়।

বছরে ২-৩ বার বরোজে মাটি ফেলা হয়। তবে কখনওই সদ্য কাটা মাটি বরোজে ফেলা উচিত নয়। এতে রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়। মাটি কাটার পর কোথাও জমা করে রেখে খুব ভাল করে রোদ খাইয়ে তারপর তা বরোজে গাছের গোড়ায় দেওয়া উচিত। যেহেতু রোগের জীবাণু মূলত মাটি বাহিত তাই মাটি ফেলার ব্যাপারে সতর্ক ও যত্নবান হওয়া দরকার।

অণু বা মাইক্রো সেচ পদ্ধতি পান চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল। ফোঁটা বা বিন্দু সেচ (drip irrigation) ব্যবহারে ভাল ফলন পাওয়া যায়। রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়, জলের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। বরোজে কখনওই ভাসিয়ে সেচ দেওয়া উচিত নয়। আবার নিকটবর্তী পুকুর বা ডোবা থেকে জল এনে তা উঁচু থেকে ঢাললেও ক্ষতি হয়—এতে রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ে। বরোজে যাতে জল না জমে সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। তাই বর্ষার সময় বরোজে সেচ না দেওয়াই ভাল। লতার গোড়ায় জল জমে থাকা ক্ষতিকর। আমাদের মনে রাখা উচিত যে পান পাতা আমরা কাঁচা অবস্থায় খাই। পাতা তোলার পর সরাসরি তা বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই যথেচ্ছভাবে বিষাক্ত ওষুধ পান গাছে দেওয়া ঠিক নয়। রোগ পোকা দমনের ওষুধ নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। জৈব পদ্ধতি, জৈব ওষুধ অথবা কম বিষাক্ত তামাঘটিত ওষুধ ব্যবহার করা ভাল। 'প্রতিকার' ব্যবস্থার তুলনায় 'প্রতিরোধ' বা 'প্রতিষেধক' ব্যবস্থা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রতিষেধক' বা 'প্রতিরোধ' ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১) বরোজের মাটি শোধন : নতুন বরোজের ক্ষেত্রে সূর্যের আলো ও তাপশক্তির সাহায্যে মাটি শোধন করা খুবই জরুরি (সোলারাইজেশন)।

২) চারা (লতা) বা বীচন (কাটিং) নির্বাচন : সতেজ রোগমুক্ত, ৪-৫ বছরের পুরনো বরোজ থেকে চারা (লতা) নিতে হবে এবং গাছের (লতার) উপরের দিকে ১ মিটারের মধ্য থেকেই বীচন (কাটিং) সংগ্রহ করতে হবে। স্থানীয় (সেই এলাকার) বরোজ থেকে চারা (বীচন) সংগ্রহ করা ভাল।

৩) চারা বা বীচন শোধন : স্থানীয় বরোজ থেকে চারা বা বীচন সংগ্রহ করলে সেই বরোজের পান গাছে দু'বার (১৫ দিনের ব্যবধানে) তামাঘটিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে নেওয়া উচিত। এছাড়া মাটিতে লাগানোর আগে চারা বা বীচন তামাঘটিত ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে নেওয়া দরকার। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ছত্রাকনাশক দ্রবণে চারা/বীচন চুবিয়ে রেখে শোধন করার পর তা ছায়াতে কিছুক্ষণ রেখে (চারার গায়ে লেগে থাকা দ্রবণ শুকিয়ে নিয়ে) মাটিতে লাগাতে হয়। চারা লাগানোর গর্তগুলি ছত্রাকনাশক দিয়ে ভিজিয়ে নিলে ভাল হয়।

৪) সারের দূরত্ব : দু'টি সারির (পিলির) মধ্যে ২ ফুট (প্রায় ৬০ সেমি দূরত্ব রাখতে হবে)। ঘন করে চারা লাগিয়ে রোগ-পোকার উপদ্রব বাড়তে পারে।

৫) সার প্রয়োগ : জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। তবে মাটিতে রস থাকা অবস্থায় বা বর্ষাকালে অল্প পরিমাণে সুপার ফসফেট এবং মিউরেট অফ পটাশ সার দেওয়া যেতে পারে। এতে রোগ পোকার আক্রমণ কম হবে। রাসায়নিক সার এমনভাবে দিতে হবে যাতে তা গাছের গায়ে না লাগে। রাসায়নিক সার বছরে একবার দেওয়া যথেষ্ট। কাঠা প্রতি ৩ কেজি ফসফেট এবং ৩ কেজি পটাশ দিতে হবে, এতে রোগ এবং পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

৬) সেচ : অতিরিক্ত সেচ দেওয়া উচিত নয়। ভাসিয়ে সেচ দেওয়া যাবে না। উঁচু থেকে জল ছিটিয়ে বা ছুড়ে দেওয়া যাবে না।

৭) লতা নামানো : লতা নামানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে গাছের নিচের পাতাটি মাটি থেকে বেশ কিছুটা উপরে থাকে। আর বর্ষাকালে লতা নামালে লতা যাতে মাটিতে স্পর্শ না করে তা খেয়াল রাখতে হবে।

কৃষক বন্ধুরা মনে রাখবেন পান আমরা সরাসরি খাই, কাঁচা পাতা খাই, তাই খুব প্রয়োজন ছাড়া ওষুধ দেবেন না। আর ওষুধ দেওয়ার অন্তত ১৫ দিন পর পান পাতা তুলবেন বাজারে বিক্রির জন্য।

পান আমরা সরাসরি খাই। কাঁচা পাতা খাই। তাই খুব প্রয়োজন ছাড়া ওষুধ দেবেন না। আর ওষুধ দেওয়ার অন্তত ১৫ দিন পর পান পাতা তুলবেন বাজারে বিক্রির জন্য।

কাজুবাদামের গামোসিস রোগ ও তার প্রতিকার

সাধারণত ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে কাজু বাদাম গাছের ত্বকে কালো ফাটা দাগ হতে ৩-৪ মাস সময় লাগে। সময়মতো পরিচর্যা না করলে চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে গাছ শুকিয়ে মরে যেতে পারে। প্রতিকার লিখছেন বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝাড়গ্রাম আঞ্চলিক গবেষণাকেন্দ্রের সহকারী অধ্যাপক **ড. শুভেন্দু যশ**

পশ্চিমবঙ্গের লালচে কাঁকুড়ে মাটি অঞ্চলের একটি অন্যতম বাগিচা ফসল হল কাজুবাদাম। এই ফসলের উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ব্রাজিলে। আমাদের দেশে পর্তুগিজরা প্রথম কাজুবাদামের আমদানি করে গোয়াতে। সাধারণত মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও বননায়নের জন্য কাজুবাদামকে নিয়ে আসা হয়েছিল। বর্তমানের আমাদের দেশে সমুদ্র উপকূল রাজ্যগুলিতে কাজুবাদামের চাষ হয়। এদের মধ্যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা অন্যতম।

কাজুবাদামের বিভিন্ন রোগ পোকার মধ্যে গামেসিস রোগ অন্যতম। কাজুবাদাম গাছের কাণ্ড বা ডালপাল থেকে এক ধরনের কালচে লাল রঙের আঠা বের হয়। এই আঠা বের হওয়াকে আমরা ইংরাজিতে গামোসিস বলে থাকি। সাধারণত কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা, ছত্রাকের সংক্রমণ ও প্রাকৃতিক আঘাত ঘটলে কাণ্ড থেকে আঠা বের হয়। এদের মধ্যে ছত্রাক-ঘটিত আঠা নিঃসরণকে আমরা গামোসিস রোগ বলি। প্রাকৃতিক আঘাতজনিত আঠা নিঃসরণ থেকে গামোসিস রোগের লক্ষণ অনেক আলাদা।

লক্ষণ :

এই রোগে প্রথমে গাছের কাণ্ড ও বিভিন্ন ডালের ত্বক সূক্ষ্ম ফাই দেখা যায়। ধীরে ধীরে এই ফাটা অংশ বাড়তে থাকে ও ত্বকে ঘন কালো দাগ দৃষ্টি হয়। কাণ্ড বা ডালের ত্বকের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত কালো হয়ে শুকিয়ে যায়। এই কালো ফাটা অংশ থেকে আস্তে আস্তে কালচে লাল রঙের ঘট আঠা বেড়িয়ে আসে। কিছু কিছু জাতে আঠা নিঃসরণ কম হয়। কাণ্ডের ত্বক কালো হয়ে শুকিয়ে যাওয়ার জন্য গাছের খাবার সংবহনে ব্যাঘাত ঘটে। কাণ্ডের পরিধির ৩/৪ ভাগের বেশি কালো হয়ে শুকিয়ে গেলে সেই গাছকে আর কোনওভাবে বাঁচান যায় না। সাধারণত ছত্রাকের সংক্রমণ থেকে ত্বকে কালো ফাটা দাগ হতে তিন-চার মাস সময় লাগে। রোগের লক্ষণ বর্ষাতে শুরু হয় ও ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে। সময়মতো পরিচর্যা না করলে চার থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে গাছ শুকিয়ে মরে যায়। কাজুবাদাম ও আম একই গোত্রের ফসল হওয়ার জন্য আমেতেও এই রোগ দেখা যায়।

বছরের বিভিন্ন সময়ে গামোসিস সংক্রমিত শুকনো ডাল বাগানের নিচে পড়ে থাকে। এই সমস্ত ডাল থেকে রোগ জীবাণু কাজুবাদামের গাছে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং, বাগান পরিষ্কার করে রোগাক্রান্ত ডাল আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া দরকার।

প্রতিকার : গামোসিস-এর বৃদ্ধি ধীরগতির হওয়া সত্ত্বেও সারা বছর এই রোগ উপস্থিত থাকার জন্য রোগ প্রতিকার করা সহজ নয়।

- রোগ প্রতিরোধী কাজুবাদামের ..... ব্যবহার করা দরকার। বিধান ঝাড়গ্রাম-২, ভেজুরলা-4, বিপিপি-4, উল্লাল-3, এনআরসিসি-2 ইত্যাদি কাজুবাদামের জাতে একদম গামোসিস রোগ হয় না।
- বর্ষার আগে গামোসিস সংক্রমিত ছোট ডালের গোড়া থেকে ছেঁটে দেওয়া উচিত। এর ফলে গামোসিস দাগ যুক্ত ডালের পরিমাণ কমে যাবে। ডাল ছাঁটার পর কাটা অংশে থায়োফানেট মিথাইল ছত্রাক নাশক জলে গুলে (১ গ্রাম/লিটার) ব্রাশ দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।
- বছরের বিভিন্ন সময়ে গামোসিস সংক্রমিত শুকনো ডাল বাগানের নিচে পড়ে থাকে। এই সমস্ত ডাল থেকে রোগ জীবাণু কাজুবাদামের গাছে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং, বাগান পরিষ্কার করে রোগাক্রান্ত ডাল আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া দরকার।
- থায়োফানেট মিথাইল (ফরোকো নামে বাজারে পাওয়া যায়) ১গ্রাঃ/লিটার হিসাবে ডলে গুলে জুন মাসে ও আগস্ট মাসে স্প্রে করা উচিত। রোগের পরিমাণ বেশি থাকলে প্রয়োজনমতো আর একটি স্প্রে সেপ্টেম্বর মাসে করা যেতে পারে।
- যদি কাজুবাদামের প্রধান কাণ্ড বা মোটা ডালে গামোসিস দাগ থাকে, তাহলে অনেক সময় রোগাক্রান্ত গাছের ছাল ছুরি দিয়ে চেঁচে ফেলে দেওয়া যায়। এর কাটা অংশে ভাল করে থায়োফানেট মিথাইল ৫ গ্রাম/লিটার জলে গুলেন ভাল করে প্রলেপ দেওয়া উচিত। কাণ্ডেলর ছাল চাঁচার সময় সতর্ক থাকা উচিত যেন চারদিকে অনেকটা নিরোগ ছাল থাকে।

আবহাওয়া

৬/৫/২০১ থেকে ১২/৫/২০২১পর্যন্ত আগাম আবহাওয়া বার্তা ও কৃষি উপদেষ্টা

শুক্রবার বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৪.৩ থেকে ৩৬.৬ এবং ২৬.৮ থেকে ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হতে পারে। আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে। সকাল ও বিকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা যথাক্রমে ৭৩ থেকে ৮১ ও ৩৩ থেকে ৪২ শতাংশ থাকতে পারে। বাতাস ২০ থেকে ২৪ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বইতে পারে। বজ্রপাত, শক্তিশালী বাতাস বইবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মুগ

শুঁটি পরিপক্ক হতে শুরু করেছে। শুঁটি ছিদ্রকারী পোকা ও সাদামাছি দ্বারা বাহিত হলুদ মোজেক ভাইরাসের আক্রমণের সম্ভাবনা। শুঁটি ছিদ্রকারী পোকার জন্য ফেম স্প্রে করতে হবে। সাদামাছির আক্রমণ ঠেকাতে ওভেরণ স্প্রে করতে হবে। স্প্রে সবসময় যখন মৃদু বাতস বইবে তখন করতে হবে।

ধান

পরিপক্ক ধান দ্রুত কেটে শুকানো, ঝারা, ইত্যাদি শেষ করে ফেলতে হবে। কালবৈশাখীর কারণে ধান ঝরে যেতে পারে।

সবুজ সার চাষ

বোরোধান কেটে নেওয়ার পর ফাঁকা জমিতে গভীর চাষ দিতে হবে যাতে মাটি ওলটপালট হয়ে যায়। মাটির ভিতরে থাকা পোকার লার্ভা, ডিম ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায় ও পরবর্তিতে ধানের চারা মাটির দ্বারা বাড়িত রোগ পোকা দ্বারা আক্রান্ত না হয়। সবুজ সারের জন্য লাঙল দেওয়াল পর ধইঞ্চা বীজ বুনে দিতে হবে।

ডাকবাক্স

চিঠি পাঠান:
চাষবাস
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭২
chashbas
@sangbadpratidin.in